‘ইংরেজি হাঠাও’

রমা কুন্ডু

‘হে আমার একান্ত প্রিয়তম ভাষা
আমি দাঁড়িয়েছিলাম তোমারই সেবায়
রাতের পর রাত...
অনেক বছর ধরে সেই এক স্মৃতি
আমার পিতৃভূমি, –ছিল তোমার মধ্যেই।”

এক বিখ্যাত স্বদেশ–নির্বাসিত কবির অন্তর–বেদনাসঞ্জাত বোধ যে ভাষা মানুষের কত প্রিয় হতে পারে। যে পিতৃভূমি থেকে উচ্ছিন্ন কোনো হতভাগ্যের কাছে তা হতে পারে পিতৃভূমির প্রতিরূপ। বস্তুত, কোনো মানুষের কাছে তার জাতিসত্তার এক প্রধান প্রতিমা তার ভাষা।

জাতিসত্তা গঠনের এক প্রধান উপাদানও ভাষা, যেমন উপাদান ধর্ম, সংস্কৃতি, ভূগোল। কখনও মনে হতে পারে ভাষা, বাকী উপাদান গুলির চাইতেও জোরদার। ইয়োরোপ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে যে বহু সমাজ ও সংস্কৃতিতেও তাদের অমিল নগণ্য, মিল প্রকট। তবু তারা আলাদা রাষ্ট্র; অবশ্যই ভূগোল রাজনীতি দায়ী। কিন্তু মূল যে অমিল তাদের পৃথক ও বিশিষ্ট করেছে তা ভাষা। অবশ্য এ পার্থক্যও আপাত। কারণ ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির প্রত্যেকটি ইন্দো–জার্মান বংশোদ্ভূত এবং তাদের উৎস লাতিন, যেমন আমাদের উত্তর পূর্ব্ব ভারতের অসংখ্য ভাষার উৎসমুখে রয়েছে সংস্কৃতের আদি নির্ঝরণী।

তবে কি এ যুক্তিতে ভারতের ভেঙে যাওয়ার কথা অসংখ্য রাষ্ট্রে এবং অনিবার্যভাবে, কারণ ইয়োরোপের ধর্ম ও সমাজ–সংস্কৃতি এক হওয়া সত্বেও এবং বিভিন্ন হয়ে যাওয়া ভাষা এক বংশোদ্ভূত ও এক উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও এতগুলি বিচ্ছিন্ন জাতি তথা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে সেখানে ভারতের পরিস্থিতি আলাদা। এখনে হিন্দু ধর্ম–প্রবীণ হলেও হিন্দুরা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়; মুসলিম সংখ্যায় যথেষ্ট; আনুপাতিক হারে ক্রিশ্চান বা শিখ, বৌদ্ধরা কম হলেও সংখ্যায় নগণ্য নন। সমাজ–সংস্কৃতি শুধু বহু বিচিত্রই নয়, বি–সমও। আর ভাষা–সংবিধান–স্বীকৃত ভাষার সপ্তদশ অশ্বের রথে চড়ে যে প্রজাতন্ত্র যাত্রা শুরু করেছিল আজ সে রথ টলোমল। কারণ সপ্তদশ বেগবান্, কেউ কারো সাথে চলতে রাজী নয়। তারা পরস্পর যুযুধান।

এ ছাড়াও সে সময় নগণ্য মনে করা হয়েছিল এরকম বহু স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠীও আজ স্বীকৃতি দাবীতে সোচ্চার। দেশাই–এর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে যখন তিনি দার্জিলিং–এ আসেন সে সময় নেপালী ভাষা স্বীকৃতির দাবী উঠলে দেশাই বিব্রতভাবে বলেন, তাহলে ভারতে অন্ততঃ আরো দুশো ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হয় এবং এমন ঘটনার ফলশ্রুতিতে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সম্ভব। দেশাই–এর কথার প্রথম অংশটি যথার্থ, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি কি তর্কাতীত?

আমাদের দেশের নৃতাত্বিক রূপটি এত অপরিসীম বৈচিত্র্যময় যে এখানে অগণ্য জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে যারা প্রত্যেকেই স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। প্রতিটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর নিজস্ব গোষ্ঠীভাষা বা মাতৃ ভাষা থাকা সম্ভব। প্রধান সপ্তদশ ভাষার সঙ্গে তার মিল না থাকতেও পারে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে যে সময়ে ভাষাপ্রশ্ন নিয়ে আলাপ–আলোচনা চলছিল সে সময়ে এ ভাবনাটা এত প্রকট হয়নি কেন? এর রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়াও আর একটি কারণ আছে যা আমাদের স্বাধীনতার পরে এতাবৎকালের অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। গত ত্রিশাধিক বছরে আমাদের দেশের

বহুধাবিভক্ত অনগ্রসর/উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর কিছু হোক্ বা না হোক্ একটা আত্ম–সচেতনতা এসেছে। ভোটের রাজনীতি এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। এছাড়া আছে অনগ্রসর, তপশীলী, উপজাতি প্রভৃতির প্রতি সরকার অনুসৃত বিশেষ নীতি। এ দু'য়েরই প্রয়োগ সঠিকই হয়েছে এমন নয়, তবু তা গোষ্ঠীচেতনাকে জোরদার করেছে। এ ছাড়া শিক্ষার প্রসারও কাজ করেছে। এই সব বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী থেকে যে অল্প কিছু যুবক লেখাপড়া শিখেছেন তাঁরা অন্যান্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগতিায় বিভ্রান্ত ও একক বোধ করেছেন – তাঁদের বিপর্যস্ততার বোধ ক্রমে তাঁদের নিজ ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী, কখনো উগ্র করেছে। তাই নেপালী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যদি আরও দুশোটি ভাষার দাবী ওঠে তা আশ্চর্যজনক নয়।

দু'চার জন আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য উন্নাসিক ছাড়া প্রত্যেকের কাছেই তার মাতৃভাষার প্রিয়তা ও গুরুত্ব অসীম। তাই আত্মসচেতন কোনো জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষার স্বীকৃতি চাইবে এ তো স্বাভাবিক। তাহলে এতে করে শংকা দেখা দিচ্ছে কেন? শংকার কারণ ঘটে তখনই যখন স্বাতন্ত্র্য ভাবনা অসহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহ বিস্ফোরণের পথ নেয়। বিদ্রোহ/বিস্ফোরণ এক মরিয়া কর্ম। এখন প্রশ্ন এই মরিয়া মনোভাব এবং তৎপূর্বগামিনী অসহিষ্ণুতার কারণ কী? মরিয়া মনোভাব আসে গভীর অবিশ্বাস ও অনাস্থা থেকে। এই অবিশ্বাস থেকে সংবিধান স্বীকৃত সপ্তদশও মুক্ত নয়। যার প্রমাণ বিগত বছরগুলিতে রাজ্যে রাজ্যে ভাষা–আন্দোলন, কোথাও ভাষা–দাঙ্গা। দেবনাগরীকে সর্বভারতীয় লিপির সম্মান দেওয়া হয়েছিল তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। কিন্তু কার্যত এর ফল দাঁড়িয়েছিল অন্যরকম। দেবনাগরীর সঙ্গে হিন্দী লিপির সাযুজ্যতায় হিন্দী ভাষীরা অহেতুক উল্লাসিত হলেন –অহিন্দীভাষীরা শংকিত। দক্ষিণীদের অশান্তিপ্রিয়তার বদনাম নেই। কিন্তু সে সময় মাদ্রাজেও ট্রেন পুড়েছিল, যখন বিহারে দোকান–হাট স্কুল–কলেজের অহিন্দী নাম, এমনকি গাড়ীর ইংরেজী নম্বরের উপরও অসহিষ্ণু আলকাতরার স্থূল বিলেপন ঘটছিল। এবং ১৯৫৬–ই শেষ নয়। মাঝে মাঝেই এ দুর্ভাগ্যজনক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এবং দুঃখের বিষয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে আগে রাজনারায়ণের 'আংবেজী হাটাও' বলে হুংকারের কথা অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। কিন্তু এটা শুধু একটা রাজনারায়নী তামাসামাত্র ছিল না। রাজনারায়ণ অত্যন্ত সরবে ও কৌতুককরভাবে যা করেছিলেন তা ছিল শুধু তাঁদের দলেরই নয়–উত্তর ভারতের বহু দলের বহু নেতৃস্থানীয় লোকের এক বিশেষ সুবিধাবাদী চাতুরীর প্রকাশ–যে ইংরেজী হটলে তখন বাধ্য হয়ে বাকীরা হিন্দীর শরণাপন্ন হবে– যদিও মুখে তাঁরা সকলের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান দিতে রাজী ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে উত্তর ভারতের বহুলাংশে এক ঔৎসুক্য আছে বাকি দেশের উপর হিন্দীকে জবরদস্তি আরোপ করার। এই জবরদস্তি ও তজ্জনিত হতাশাই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে পুষ্ট করে। না হলে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, এমনকি সবকটি গোষ্ঠীর মাতৃ ভাষার স্বীকৃতিও অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ আনে না। বরং আমাদের দেশের সংস্কৃতি এত বিচিত্র যেখানে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের সসম্মান স্বীকৃতি ছাড়া শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হওয়া শক্ত। বহুভাষিক সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সামরিক সংহতির ষ্টীম রোলারের তলায় বহু–বিষম সংস্কৃতিতে সমান নিরাবয়ব করে দিতে পারে। কিন্তু আমাদের বহুঘোষিত নীতি তো তা নয়। আমাদের নীতি তো সকলের সব বৈচিত্রাকে সসম্মানে মেনে নেওয়া ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠা করা।

বস্তুত, এই দুটি পরস্পর সংযুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি হয় না। কিন্তু আমাদের ঘোষিত নীতির প্রথম অংশটি নানান্ চাপে কিছুটা অনুসৃত হলেও দ্বিতীয় অংশটি নিদারুণ অবহেলিত। কাজেই প্রথমটিও কার্যকর হচ্ছে না। একদা আমাদের জাতীয় সংহতি কমিটি নামক এক সভা ছিল। এমন একটি সভার যা প্রথম কর্তব্য ছিল তা হল এখানের বিচিত্র মানবগোষ্ঠীকে কোন কোন সূত্রে সংযুক্ত করা যেতে পারে সেইগুলি খুঁজে নিয়ে অবিলম্বে তার বিকাশের ব্যবস্থা করা। এর জন্য প্রথমেই দরকার ছিল এমন একটি সাধারণ লিপি যা সহজ, বিজ্ঞানসম্মত,

এবং সর্বোপরি যাকে ঘিরে কোনো সন্দেহ, সংশয় দেখা দেবে না যে কেউ বেশি সুবিধা পাচ্ছে, কেউ কম। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার রোমক বা ইংরেজী লিপির ব্যবহার করে এই সমস্ত সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক হিশেবনিকেশের গোলকধাঁধাঁয় যথার্থ চিন্তাশীল মানুষের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় ধূলো পড়ল। শোনা যায় অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিক উদ্যোগে রোমক লিপি–র একটি .Key board তৈরী করেছিলেন যার আওতায় ভারতের প্রধান সব কটি আঞ্চলিক ভাষাকে তিনি আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেও একক সাধনার ধন হয়ে রইল। একে কাজে লাগাবে এমন উদ্যোগী প্রশাসক/রাজনীতিক কই? অপর দিকে, ভাষা–নীতি এমন এক অচলাবস্থায় এসে আটকে রইল যাতে আর্যাবর্ত বনাম দাক্ষিণাত্য, উত্তর–পশ্চিম বনাম উত্তর–পূর্বে বহু পুরানো সংঘাতসকল বেঁচে রইল ও বাড়বার সুযোগ পেল, পাচ্ছে।

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক রাজনীতিকরা এমন এক অদ্ভুত ভাষানীতি নিচ্ছেন যাকে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা' এই প্রবাদবাক্যটি ছাড়া অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করা যায় না। যেহেতু ইংরেজরা কোন এক কালে এদেশের শাসক ছিল তাই ইংরেজি শেখা মানে দেশদ্রোহিতা এই ধরণের একটা শিশুপাঠ্য যুক্তি দেখিয়ে একদা রাজনারায়ণরা ইংরেজী নির্বাসন দিয়ে বড় মাতৃভাষানুরাগ দেখিয়েছিলেন যার পিছনে আসলে ছিল এক চতুর হিশেব–অপরাপর অঞ্চলের উপর উত্তরাঞ্চলের প্রধান্য প্রতিষ্ঠার। আজ পঃ বঃ সরকার অনুরূপ নিষ্কারণে ইংরাজীকে বিদায় দিচ্ছেন বিদ্যালয় থেকে। যে ছায়া ধরার ফাঁদ পেতেও রাজনারায়ণরা সেদিন পাখী ধরতে পারেনি, আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বহস্তে সেই ফাঁদ গড়ে তাকে পশ্চিমবঙ্গে প্রোথিত করলেন। একদিন শাসককুল ভাষার ব্যাপারে তৎকালীন জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ভাষাবিদ্ সুকুমার সেনের সুপরামর্শেরপ্রতি বধির। মাতৃভাষা অবশ্যই শিক্ষণীয়, কিন্তু তার সঙ্গে এখনও একমাত্র সংযোগকারী ভাষাটির পরিচয়ের সুযোগটুকু কেড়ে নেওয়া কেন? একি শুধুমাত্র নির্দোষ নিবুদ্ধিতা, নাকি কোনা দুরভিসন্ধি প্রণোদিত সুপরিকল্পিত সর্বনাশ?

মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা, মাতৃভাষার চর্চা মানেই বিচ্ছিন্নতায় উস্কানি নয়। বিচ্ছিন্নতার জনক দুরভিসন্ধি প্রণোদিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, যা আরো অনেক মহৎ অনুভূতির মত মাতৃভাষাপ্রেমকে ভাঙিয়েও চরম সর্বনাশা খেলা খেলতে পারে?

মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা, মাতৃভাষার চর্চা মানেই বিচ্ছিন্নতায় উস্কানি নয়। বিচ্ছিননতার জনক দুরভিসন্ধি প্রণোদিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, যা আরো অনেক মহৎ অনুভূতির মত মাতৃভাষাপ্রেমকে ভাঙিয়েও চরম সর্বনাশা খেলা খেলতে পারে।